ড. সা'দত হুসাইন

‘শিক্ষিত বেকার’ শব্দযুগল আমাদের কাছে অতিপরিচিত। সেই ছাত্রজীবন থেকে বেকার সমস্যার ওপর আমাদের পড়াশোনা করতে হয়েছে, তবে সাম্প্রতিককালে প্রখর তীব্রতা নিয়ে শব্দযুগল আমাদের অনুভূতিকে বিদ্ধ করছে। সব শ্রেণির নাগরিকের মধ্যে বেকার সমস্যা রয়েছে। অশিক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব উৎকটভাবে দৃশ্যমান হয় না। এই জনগোষ্ঠী স্থায়ী বেকারত্বে কম আক্রান্ত হয়। তারা কায়িক শ্রম করতে অভ্যস্ত; আগ্রহী বলা যায়। খ-কালীন কাজ, বিভাজিত কাজ (চরবপব লড়ন) করতে তাদের আপত্তি নেই। তাই মাসের কিছু দিন হলেও তারা শ্রমভিত্তিক কাজে ব্যাপৃত থাকে। এতে যে মজুরি পাওয়া যায় তা দিয়ে সংসারের আংশিক খরচ নির্বাহ করে। তাদের পুরোপুরি বেকার বলা যায় না। অর্থনীতির পরিভাষায় তাদের প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের (উরংমঁরংবফ টহবসঢ়ষড়ুসবহঃ) আওতায় গণনা করা হয়।

শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা ভিন্নতর। শিক্ষিতরা একটি সমরূপ (ঐড়সড়মবহড়ঁং) জনগোষ্ঠী নয়। তাদের স্তর-বিন্যস্ত জনগোষ্ঠীতে বিভাজিত করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রিধারী থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষার সার্টিফিকেটধারী, এমনকি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রের সনদধারী সাক্ষর ব্যক্তিও নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবি করে। আজকের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা শুধু পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সনদধারীকেই শিক্ষিত হিসেবে গণ্য করতে পারি। সাধারণ মানুষ বোধ হয় শিক্ষিতের সংজ্ঞাকে আরো সংকুচিত করতে পছন্দ করে। তারা পরীক্ষা পাস করে মাধ্যমিক স্কুলের গ-ি পার হওয়া ব্যক্তিকে শিক্ষিত বলে ধরে নেয়। যারা মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি, তাদের অনেকেই আবার নিজেদের শিক্ষিত হিসেবে পরিচয় দেয় এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি চিষঁপশবফ বলে একধরনের তৃপ্তিলাভ করে।

শিক্ষার স্তর যা-ই হোক না কেন, যে ব্যক্তি নিজেকে শিক্ষিত বিবেচনা করে তার চলন-বলন, আচার-আচরণে কিছু ভিন্নতা লক্ষণীয়। তার চাহিদায় বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দেয়। সে কায়িক শ্রম করতে চায় না। অন্য কাজেও তার বিশেষ আগ্রহ নেই। মূল উৎসাহ চাকরিতে। উদ্যোক্তা হওয়াতে সংগত কারণে অনীহা রয়েছে। এতদঞ্চলে উদ্যোক্তা হতে হলে যে পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনের প্রয়োজন হয়, তা জোগাড় করা সাধারণ পরিবারের একজন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর পক্ষে সম্ভব নয়। অতিসামান্য মূলধন নিয়ে কৃষি, ব্যবসা, বিপণন, সেবা খাতে যেসব কাজ করা যেতে পারে, সেগুলোতে তার মন ভরে না। সে চায় একসঙ্গে বড় আকারের কিছু করতে, যাতে সে বুক ফুলিয়ে বলতে পারে যে সে অমুক প্রতিষ্ঠানের মালিক। ফলে সে কর্মহীন বেকারে রূপান্তরিত হয়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, পারিবারিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সংস্কৃতির একটি বিরাট দুর্বলতা হলো যে শিক্ষা আমাদের কায়িক শ্রম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ব্যক্তিজীবনে এবং পারিবারিক পর্যায়ে কায়িক শ্রমের যে কাজগুলো প্রায়ই করার প্রয়োজন পড়ে, সে কাজগুলোও আমরা করতে চাই না বা করতে পারি না। ফলে দেখা যায়, অতি সাধারণ পারিবারিক বা গৃহস্থালি কাজ করার জন্য আমাদের লোকজন ডাকাডাকি করতে হয়। কোনো কারণে লোকজন না পাওয়া গেলে আমরা অসহায় বোধ করি, কাজটি পড়ে থাকে। ছোটখাটো ব্যবসা বা সেবাজাতীয় কাজ করে কিছু অর্থ উপার্জনের সুযোগ এলে আমরা সে সুযোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকি। কথায় কথায় আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং তাদের সন্তানদের বলতে শুনি, এসব কাজ তাদের নিজস্ব বা পারিবারিক মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তারা কর্মহীন অবস্থায় পরিবারের ওপর বোঝা হয়ে থাকবে, তবু নিজে উদ্যোগে টুকটাক কিছু কাজ করে পরিবারের জন্য সম্পূরক আয় করবে না।

চাহিদার দিক থেকে শিক্ষিত বেকারদের প্রবণতা লক্ষণীয়। তাদের সবচেয়ে পছন্দের কাজ হচ্ছে সরকারি-আধাসরকারি সংস্থায় চাকরি। কারণ হিসেবে তারা মনে করে, এসব চাকরিতে কায়িক শ্রম নেই, খাটাখাটুনি কম, ফাঁকি দেওয়ার পর্যাপ্ত অবকাশ রয়েছে। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এখানে বাড়তি আয়ের (ঘুষ ও অনৈতিক কাজের মাধ্যমে) সুযোগ রয়েছে। আরো একটি আকর্ষণ হচ্ছে, চাকরিশেষে পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে। চাকরিতে ঢোকার বয়সে পেনশন যে কারো জন্য এত বড় আকর্ষণ হতে পারে, তা আমার দীর্ঘদিন জানা ছিল না। অনেক পরে জানতে পেরেছি। কিশোর-তরুণরা বাপ-দাদা, আত্মীয়স্বজন থেকে শুনে শুনে অতি অল্প বয়সে পেনশনের বিষয়টি তাদের হিসাবে ঢুকিয়ে নিয়েছে। এখন সবকিছু মিলিয়ে তারা তাদের পছন্দ নির্ধারণ করে। মনে হয় বৈষয়িক ব্যাপারে আমরা একটু বোকা ছিলাম।

বিভিন্ন কারণে কোনো দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার (১৫ থেকে ৬৫ বছর) একাংশ বেকার থাকে। অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণে দেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ কম, সবাইকে কাজে নিয়োগ করার মতো অর্থনৈতিক কর্মকা- নেই। মন্দার কারণে সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকা-ে ভাটা দেখা দেয়। সরাসরি উৎপাদনে এবং আনুষঙ্গিক কর্মকা-ে ব্যাপৃত ছিলেন এমন অনেকে শ্রমিক-কর্মচারী নির্বাহী ছাঁটাইয়ের আওতায় পড়ে বেকার হয়ে যান। শিল্প-কারখানা ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি আসার কারণে যে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে তার কারণে শ্রমিক-কর্মচারীর একাংশ অপ্রয়োজনীয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। তারাও পর্যায়ক্রমে বেকারের দলে শামিল হয়। কিছু কর্ম ধারাবাহিকভাবে

মৌসুমিক কর্ম হিসেবে স্বীকৃত। মৌসুম শেষ হলে এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। নতুন মৌসুম না আসা পর্যন্ত তাদের অনেকে বেকার থাকে। সবশেষে রয়েছে স্বভাবগত কারণে কর্মহীনদের দল। এরা কোনো কাজ করতে পছন্দ করে না, কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা এদের ধাতে সয় না। তাই এরা কর্মহীন থাকে। বাপের হোটেলে খায়; হেসেখেলে, ঘুমিয়ে, আলসেমি করে সময় কাটায়। এদের বেকার হিসেবে গণ্য করা হয় না। এদের বলা যায় খধুধনড়ধঃ বা নিষ্কর্মা। আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় ‘বাদাইমা’। এদের ওপর আকর্ষণীয় লেখা রয়েছে। উন্নত দেশেও এ ধরনের লোক রয়েছে। এই তো সেদিন নিউ ইয়র্কের ক্যামিলাস এলাকায় মাইকেল রোতোন্ডো নামের এক নিষ্কর্মা যুবককে তার মা-বাবা কোর্টের মাধ্যমে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন।

সাম্প্রতিককালে শিক্ষিত বেকারসংক্রান্ত বিচিত্র যে দুটি সংবাদ প্রতিবেদন আমাদের দৃষ্টি কেড়েছে, তার একটি এসেছে বাংলাদেশ থেকে, অন্যটি ভারত থেকে। দুটি সংবাদের মূল বিষয় হচ্ছে সরকারের নিম্নস্তর পদে বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত বেকারের আবেদন। বাংলাদেশি খবরটির শিরোনাম হচ্ছে, ‘খাদ্য অধিদপ্তরে ১১৬৬ পদে ১৪ লাখ আবেদন।’ ভারতীয় সংবাদটির শিরোনাম হচ্ছে, ‘পিয়ন পদে ৩৭০০ পিএইচডি ডিগ্রিধারীর আবেদন।’ খবর দুটির চুম্বক অংশ উদ্ধৃতির আকারে তুলে ধরছি:

খাদ্য অধিদপ্তরে এক হাজার ১৬৬ পদে ১৪ লাখ আবেদন। প্রতি পদে প্রার্থী এক হাজার ১৮২ জন। খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য উপপরিদর্শক ও সহকারী উপপরিদর্শকসহ ২৪ ক্যাটাগরিতে এক হাজার ১৬৬টি পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এসব পদের বিপরীতে ১৩ লাখ ৭৮ হাজার ১২৩টি আবেদন পড়েছে। অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণির এসব চাকরিতে প্রতিটি পদের জন্য চাকরিযুদ্ধে লড়তে হবে এক হাজার ১৮২ জনকে।’ ভারতের খবরটি হচ্ছে, ‘পিয়ন পদে ৩৭০০ পিএইচডি ডিগ্রিধারীর আবেদন।’ ভারতজুড়ে বেকারত্বের চেহারাটা ঠিক কেমন, তা বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার সময়ই উঠে আসে। অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতার চাকরির জন্য বহু উচ্চশিক্ষিতের আবেদনের হিড়িক পড়ে যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, ভারতে বেকারের হার বাড়ছে হু হু করে। আবার সে রকমই একটা ছবি উঠে এলো ভারতের উত্তর প্রদেশে। রাজ্য পুলিশের টেলিকম শাখায় নিয়োগ দেওয়া হবে ৬২ জন পিয়ন। বিজ্ঞপ্তিতে এই পদের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণি পাস। আবেদন জমা পড়েছে ৯৩ হাজার ৫০০। রবিবার টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ‘৫০ হাজারের বেশি স্নাতক, ২৮ হাজার স্নাতকোত্তর ও ৩৭০০ পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রার্থী পিয়ন পদে চাকরির জন্য আবেদন করছেন। বিপুলসংখ্যক অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর আবেদন পাওয়ায় পরীক্ষা পদ্ধতি বদলানোর কথা ভাবছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।’

প্রতিবেদনগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে পদগুলোর জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে, দুই দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে এগুলো নিম্নস্তরের পদ। এসব পদে চাকরির জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন দরখাস্তকারীদের বিপুল অংশের যোগ্যতা তার চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে বেশি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার (অর্জিত ডিগ্রি) পরিসংখ্যান দেওয়া হয়নি। তবে এদের মধ্যে যে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থী রয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। ভারতে পিয়ন পদে আবেদনকারীদের মধ্যে তিন হাজার ৭০০ জন পিএইচডি ডিগ্রিধারী রয়েছেন। অবাক করার মতো সংবাদ! এমনটি কী করে হতে পারে?

সমস্যাটি কি বেকারত্ব তথা কর্মসংস্থানের সমস্যা, না শিক্ষার গুণগত মানের সমস্যা তা পর্যালোচনার দাবি রাখে। দেশে কর্মসংস্থানের যত অভাব থাকুক না কেন, একজন পিএইচডি ডিগ্রিধারী পিয়নের চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে যাবে কেন? পিএইচডি হচ্ছে অ্যাকাডেমিক জগতের সর্বোচ্চ ডিগ্রি। একজন পিএইচডি ডিগ্রিধারী ব্যক্তি নিজস্ব পারদর্শিতায় একটি গবেষণাকাজ সম্পন্ন করতে পারেন, গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দিতে পারেন। তিনি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখতে পারেন, প্রগাঢ় বিশ্লেষণ করতে পারেন। তাঁর লেখায় বা বক্তব্যে দৃষ্টিকটু ভুল থাকবে না। তাঁর বক্তব্য বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক হবে। বক্তব্যে অভ্যন্তরীণ অসংগতি (ওহঃবৎহধষ ওহপড়হংরংঃবহপু) থাকবে না। তাঁর প্রকাশশৈলী গ্রহণযোগ্য মানের হবে। উপর্যুক্ত গুণে গুণান্বিত একজন পিএইচডি অ্যাকাডেমিক জগতে কোনো উপার্জনধর্মী কাজ পাবেন না, এমনটি বিশ্বাস করা যায় না। তাঁর মুরব্বি, অধ্যাপক বা শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে একটি কাজ জুগিয়ে দেবেন, যা বেতনের দিক থেকে উঁচু স্তরের না হলেও মর্যাদার দিক থেকে খাটো হবে না।

যে পিএইচডি ডিগ্রিধারী পিয়নের চাকরির জন্য আবেদন করেন তাঁর অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা ও মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সন্দেহ করার প্রভূত যুক্তি আছে। আজকাল অনেক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী লোকের দেখা পাওয়া যায়, যারা শুদ্ধ ইংরেজি বা বাংলায় (মাতৃভাষায়) একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারেন না। এক অনুচ্ছেদের মধ্যে বানান ও বাক্যের ভুলের সংখ্যা ১০-১২ ছাড়িয়ে যায়। পিএইচডি সার্টিফিকেটধারীর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটা একেবারে বিচিত্র নয়। এঁরা হয়তো বা অতি অখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মেশিন থেকে গড়িয়ে পড়া পণ্যসামগ্রী। বিশেষ পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এঁদের সৃষ্টি হয়েছে; তার সঙ্গে জ্ঞান বা পারদর্শিতা অর্জনের কোনো সম্পর্ক নেই।

পিয়ন পদের জন্য এত হাজার হাজার, লাখ লাখ আবেদন পড়লেও আমরা দেখতে পেয়েছি যে হিসাব-নিকাশ, তথ্য-সংগঠন, সৃষ্টিধর্মী কিংবা গবেষণাসংশ্লিষ্ট কাজের জন্য একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও পর্যাপ্তসংখ্যক প্রার্থী পাওয়া যায়

না। যে কাজে সামান্য কিছু কায়িক শ্রম জড়িত আছে, কর্মস্থলে শৃঙ্খলার বিষয়টি সম্পর্কে প্রার্থীরা জ্ঞাত রয়েছে অথচ (অনৈতিক) বাড়তি আয়ের সুযোগ নেই সে কাজে শিক্ষিত বেকাররা উৎসাহী নয়। বাড়তি আয় না থাকলে, কমপক্ষে এমন বাড়তি সুবিধা থাকতে হবে, যার বৈষয়িক সংশ্লেষ রয়েছে। পরিশৃঙ্খল পরিবেশে খাটাখাটুনি করে সপ্তাহ বা মাসের শেষে শুধু বেতন পাওয়া যাবে এমন কাজে যোগ দিতে শিক্ষিত বেকাররা আগ্রহী নয়। ছাদের নিচে বসে, পড়াশোনা ব্যতিরেকে মাঝেমধ্যে ফাঁকি দিয়ে চলা যায় এবং সঙ্গে কিছু বাড়তি আয়ের সুযোগ আছে এমন কাজের প্রতি রয়েছে তাদের দুর্নিবার আকর্ষণ। শিক্ষাঙ্গনকে দুর্নীতিমুক্ত, বাস্তবমুখী পারদর্শিতা অর্জনের নিশ্চিতি ভূমিতে রূপান্তরিত না করা গেলে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শ্রমবাজারের প্রতিস্থাপক হিসেবে না দেখে শিক্ষার চূড়ান্ত মর্যাদাবান পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে আলোকবর্তিকা হিসেবে নিজ অঙ্গন উদ্ভাসিত করে চলতে পারে। এদের জন্য ব্যবসা-শিল্প গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাস্তবমুখী কার্যকর ‘ইন্টার্নশিপ’ কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ডিগ্রি পাওয়ার পরপরই তারা কর্মস্থলে যোগ দিতে পারে। তখন আর পিএইচডিডিগ্রিধারীদের পিয়নের চাকরির জন তাঁদের আবেদন করতে হবে না।

লেখক : সাবেক মন্ত্রিপরিষদসচিব ও পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান